দুরবীনে ভাসা জীবন-৮

গ্রাম্য রাজনীতি

Awwe` ingvb

রক্তসম্বন্ধীয় না হলেও তসলিম কাকা (দের) সাথে আমাদের সম্পর্কটা রক্তের সম্পর্কের চেয়েও নিবিড়। আমাদের সম্পর্ক দুই প্রজন্মের। আমার বাবা আর উনার বাবা আগা নওয়াবুর রহমান অবিভক্তবংগ দেশের কলিকাতায় একই মেসে থেকে একই কলেজ থেকে ডিগ্রি পাশ দিয়েছিলেন। দু'জনেরই জীবন শুরু সরকারী চাকুরী দিয়ে। উনি প্রশাসনে আমার বাবা খাদ্য বিভাগে। আমার বাবা সরকারী চাকুরীতে ত্যাক্ত-বিরক্ত হয়ে পাঁচ-ছয় বছরের মাথায় ইস্তফা দিয়েছিলেন। উনি লেগে ছিলেন। অতিরিক্ত সচিব হয়ে চাকুরী জীবনের পর্দা টেনে ছিলেন। দু'জনের সম্পর্কটা বন্ধুর হলেও বাবা উনাকে মামা ডাকতেন। আমরা ডাকতাম ননু দাদা। ননু উনার ডাকনাম।

জন্ম থেকে দেখে আসছি দু'টো পরিবারের ঘনিষ্ট বন্ধন। যদিও দু'টো পরিবারের বাড়ী একই গ্রামে, তবু যোগাযোগের ভিত্তিটা কখনই প্রামভিত্তিক বা কেন্দ্রিক ছিলোনা। কালে-ভদ্রে তসলিম কাকারা দেশে বেড়াতে আসতেন। আমরাও একই কাজ করতাম। বোধকরি আমরা হয়ে উঠেছিলাম শহুরে মধ্যবিত্ত। তসলিম কাকার বাবা আগা নওয়াবুর রহমান ছিলেন আপাদমস্তক একজন নির্ভেজাল সহানুভূতিশীল মানুষ। মানুষের হাসি ও ব্যবহার এতোটা শিশুসুলভ হতে পারে উনাকে না দেখলে বিশ্বাস হতে চাইবেনা। আমাদের বাসায় উনার আগমন মানেই ছিলো আনন্দ আর ফুর্তির জোয়ার। দুর্ভাগ্য, উনি যখন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক তখন উনার স্ত্রী মানে দাদী অনেকগুলো মাটির সাথে গড়াগড়ি দেয়া সন্তান রেখে পরকালের উদ্দেশে ওয়ানওয়ে টিকেট কেটে ফেলেন। ননু দাদা সন্তানদের দিকে তাকিয়ে একাকী জীবন পার করে দিয়েছিলেন।

তসলিম কাকা আমার বড় ভাইয়ের সমবয়সী। উনার মা যখন মারা যান তখন বোধকরি উনি তখন ক্লাস টেনের ছাত্র। বাবার বদলীর সরকারী চাকুরীর কারণে উনারা তখন চাটগাঁয় মামার বাসায় থাকতেন, উনার মামা চাটগাঁর বিখ্যাত কামাল কন্ট্রাকটরের বাসা আমাদের বাসার কাছাকাছি ছিলো। দুরত্বের সুবিধার কারণেই আমাদের ঐ বাসায় প্রতিদিন যাওয়া হতো। তসলিম কাকার একমাত্র মামী রবীন্দ্রনাথের 'ফটিকের মামীর' একেবারেই উল্টো ছিলেন। তিনি মামী ছিলেন না মা ছিলেন, বোঝার কোন জো ছিলোনা। মামীর সীমাহীন আদরের পাশাপাশি দেখেছি ছোট ভাইবোনদের জন্যে তসলিম কাকার আন্তরিক মমত্ববোধ। তিনি একই সংগে পিতা ও মাতা দু'টোরই দায়িত্ব পালন করতেন। ভাই-বোনেরা ছিলেন উনার বন্ধু।

সত্তর-আশি দশকে বাংলাদেশে যারা শিল্প-সাহিত্যের সাথে অল্প-বিস্তর জড়িত তারা নিঃসন্দেহে এই মহৎপ্রাণ মানুষটিকে চিনে থাকবেন। শাহবাগের বিখ্যাত রাগীবের 'রেখায়ন'-এ ছিলো উনার আড্ডা। শুনেছি উনি এখনো নিয়মিত আড্ডা মারেন ধানমন্ডিতে রফিক আজাদ, মাকিদ হায়দারদের সাথে। বয়সের ব্যবধান অনেক হলেও শিল্প-সাহিত্যের সুবাদে তসলিম কাকার সাথে খোলামেলা মেশার সৌভাগ্য হয়েছে। তিনি নিজে কখনো লেখালেখি করেননি, কিন্তু উনি ছিলেন সচেতন ও নিবেদিত একজন পাঠক। লেখকগোষ্ঠি নিজের লেখা সম্পর্কে কোন আন্তরিক ও খোলামেলা মতামত চাইলে তসলিম কাকার শরণাপন্ন হতেন। আমার বিচারে উনি একজন উঁচু মাপের মানুষ ও বুদ্ধিজীবী।

তসলিম কাকার সংস্পর্শে এসে অনেক শিখেছি। জীবনকে দেখার ও উপভোগের ভিন্ন দৃষ্টিভংগির সাথে পরিচিত হয়েছি। উনি ছিলেন হাঁসের মতোন। সারাক্ষণ পানিতে ভিজলেও দুঃখ-কষ্ট উনাকে ভিজিয়ে দিয়ে যেতে পারতোনা। হাঁসের শুকনো পালকের মতোই থাকতেন তিনি। একই গ্রামের সন্তান বলেই হয়তো কবি কামাল চৌধুরী ও আমার প্রতি উনার ব্যক্তিগত সহানুভূতি অপ্রকাশ্য থাকতো না। উনি কথাও বলেন চমৎকার- হালকা রসাত্মক কথা বার্তার মাঝে গভীর একটা মর্মার্থ থাকতো।

উনারা আগা বংশ, সম্ভবতঃ বাংলাদেশের একমাত্র বাংলাভাষী আগা উনারা। নিজের বংশ পরিচয় নিয়েও তসলিম কাকা বেশ হাস্যরস করতেন। বিয়ে-শাদীর দাওয়াতে বেয়ারারা জোঁকের মতো লেগে থাকে বকশিশের বিনিময়ে হাত ধোঁয়ানোর খোঁজে, যেন হাত ধোঁয়ানোটাই মুখ্য। উনি এত বেশ মজা পেতেন।

পঞ্চাশ-একশ টাকা বকশিশ দিয়ে হলেও পুরো টেবিলের মানুষকে উনি বেয়ারা দিয়ে হাত ধোঁয়ানোর ব্যবস্থা করতেন। উনার যুক্তি অদ্ভুতঃ এখনতো আর বংশ মর্যাদা দেখানোর আর কোন জায়গা নেই। বাড়ীতে এখন যে কেউই দালান তুলতে পারে। ডিগ্রীধারী মানুষের অভাব নেই। পয়সা থাকলেই ছেলেমেয়েদের নামী-দামী স্কুলে পাঠানো যায়। কোন কাজের আগে মানুষজন বংশ পরিচয় জানতে চান না। এমতাবস্থায় বংশ মর্যাদার পরিচয় প্রকাশের কোন উপায় নেই। বিয়ে বাড়ীতে বেয়ারা যখন সাবান-গরম পানি দিয়ে হাত ধুঁইয়ে দেয়, তখন নিজের মধ্যে একটা নবাবী ভাব আসে- মনে হয় সত্যি আমি আগা বংশীয়।

উনার দু'জন চাচা গ্রাম-কেন্দ্রিক ছিলেন। লেদু দাদা কখনো শহরে নোংগর ফেলেননি। তিনি ছিলেন আমাদের এলাকার পোষ্টমাষ্টার। খুবই সম্মানী একজন মানুষ। কখনো কোনো চায়ের দোকানে বসেননি। তবে গ্রামে টিকে থাকতে হলে প্রভাবশালীদের সংগে তাল মিলিয়ে না-চলার মতো বাস্তবজ্ঞানবর্জিত ছিলেন না। সেকারণেই মাঝে মধ্যে কিছুটা বিতর্কিতও হয়েছিলেন। তিনি দোষগুন মেশানো একজন আদর্শ মানুষ। অন্যজন আশু দাদা শহর আর গ্রামের মাঝে নিয়মিত শার্টেল করতেন। তিনি বোধকরি সাত-আট ক্লাসের জন্যে মেট্রিকের গন্ডি পেরুতে পারেন নি। তবে কথাবার্তা বলতেন ছাপার অক্ষরে। কথা শুনলে মনে হবে তিনি কোন কলেজের বাংলা প্রভাষক। আমার আব্বার উনি ছিলেন কলিজার টুকরো। উনার কল্যাণেই আমার আব্বা কিছুদিন মির্জা গালিবে মজেছিলেন। উনার কূটবুদ্ধির দক্ষতাকে অগ্রাহ্য কিংবা অস্বীকার করার মতো মানুষ আমাদের তল্লাটে নেই। হেন কাজ নেই যেটা আশু দাদা করতে পারতেন না। উনাকে যদি কেউ কোন দায়িত্ব দিতেন, তিনি ধরেই নিতেন কাজটা সুসম্পন্ন হয়ে গেছে।

নিজের চাচা ও চাচার গ্রাম্য মাতবরদের সম্পর্কে তসলিম কাকার একটা নিজস্ব থিওরী আছেঃ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুর্বল যোগ্য কূটনৈতিকের অভাবে। আমাদের গ্রাম্য টাউটদের যদি 'ভাষা শিখিয়ে' চীন-রাশিয়া-আমেরিকায় পাঠানো যেতো, তাহলে সেসব দেশের কূটনীতিবিদরা বুঝতেই পারতেন না কি দিয়ে কি হয়ে গেলো। আমাদের সুদক্ষ গ্রাম্য টাউটরা তাদের ঘোল খাইয়ে ছাড়তেন। তিনি নিজের স্বার্থেই এসব প্রতিভাধরদের থেকে দুরে থাকতেন। আমাদেরও দুরে থাকার পরামর্শ দিতেন। আব্বার মৃত্যুর পর পারিবারিক বিষয় সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে এ- সকল প্রতিভাধরদের সাথে আমার বেশ কয়েকবার মেলামেশার সুযোগ পেয়েছিলাম। ভয়াবহ সেইসব অভিজ্ঞতা। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম বেঁচে থাকলে কখনো এধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসবোনা।

কুড়ি বছরের প্রবাস জীবনে প্রথম দিকে এধরনের কোন মানুষের দেখা না পেয়ে স্বস্তি পাচ্ছিলাম। অবশ্য মাঝেমধ্যে দু'একটা উঁকিঝুঁকি যে পাইনি তা নয়। তবে এসব ঘাই ছিলো পুঁটি মাছের ঘাই, রাঘব-বোয়ালের নয়। বন্ধু-বান্ধবের মুখে শুনেছি সিডনী হচ্ছে রাঘব-বোয়ালের মেলা। উনারা যদি দয়া করে কিছু চেয়ে বসেন, আমাদের মতো আমজনতাকে তাতে সায় দিতে হয় বারবার বিরক্ত হবার ভয়ে। এখানে, মেলবোর্ণেও মাঝে মধ্যে রাঘব-বোয়ালের ঘাঁই দেখি। বড় ভয় লাগে। দুধ খেয়ে যার মুখ পুড়েছে, সে-তো দইতে ফুঁ দিতে ভয় পাবে। পাবে না?

পুঁটি মাছের ঘাই, রাঘব-বোয়ালের নয়। বন্ধু-বান্ধবের মুখে শুনেছি সিডনী হচ্ছে রাঘব-বোয়ালের মেলা। উনারা যদি দয়া করে কিছু চেয়ে বসেন, আমাদের মতো আমজনতাকে তাতে সায় দিতে হয় বারবার বিরক্ত হবার ভয়ে। এখানে, মেলবোর্ণেও মাঝে মধ্যে রাঘব-বোয়ালের ঘাঁই দেখি। বড় ভয় লাগে। দুধ খেয়ে যার মুখ পুড়েছে, সে-তো দইতে ফুঁ দিতে ভয় পাবে। পাবে না?

E-mail: abid.rahman@ymail.com